দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ১৫-০৫-২০২৫ (পৃঃ ১৬ ,০৬)

বোরোর উৎপাদন ও দামে স্বস্তি

সরকারি ক্রয়ে দাম বাড়ানোর তাগিদ অর্থনীতিবিদদের
ধানের বাজারে সিন্ডিকেটের অস্তিত্ব নেই : কৃষক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

এবার বোরো ধানের উৎপাদন বাড়ায় হাওর অঞ্চলের কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে। অনুকূল আবহাওয়া সেখানকার কৃষকদের ভাগ্য বদলে দিয়েছে। প্রতিদিন খেত বা হাটে প্রতিযোগিতামূলক দামে ধান বেচাকেনা চলছে। এরই মধ্যে বাড়তি দরে সরকারি সংগ্রহ অভিযানের সুফলও পেতে শুরু করেছেন কৃষকরা। তবে মৌসুমের শুরুতে বোরোর এ বাজারে দর কারসাজি বা সিন্ডিকেটের কোনো অস্তিত্ব নেই বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। দেশের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় বোরো ধানের উৎপাদন, সরবরাহ ও বাজার পরিস্থিতি সরেজমিন পরিদর্শনে এ চিত্র উঠে এসেছে।

কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং সংলগ্ন কয়েকটি জেলার হাওর ও নিম্নাঞ্চলের ধান বেচাকেনার প্রধান মোকাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জের মেঘনাতীরবর্তী ধানের গল্লা। কৃষক, ব্যাপারি, পাইকারদের ধান ব্যবসার কেন্দ্রস্থল এটি। এ মোকামকে ঘিরে গড়ে উঠেছে শতশত চাতাল ও প্রায় অর্ধশত অটো রাইস মিল। আশানুরূপ সরবরাহ না থাকায় মৌসুমের শুরু থেকেই ধানের বাজার তেঁতে উঠেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন চাতাল ও অটো মিল মালিকরা।

ইত্তেফাকের সঙ্গে আলাপকালে বেশ কয়েক জন কৃষক জানিয়েছেন, 'নগদ টাকার চাহিদা মেটাতে উৎপাদিত ধানের একটি ছোট অংশ মৌসুমের শুরুতে আমরা বিক্রি করি। বাকি সব ধান বেশি দরে বিক্রির জন্য শুকিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংরক্ষণ করি।'

মোকামে ধান বিক্রি করতে আসা কৃষক এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলেছেন, হাটে ক্রেতা-বিক্রেতার কথোপকথনে প্রতিদিনের ধানের দর নির্ধারিত হয়। দরকষাকষির মাধ্যমে উভয় পক্ষই লাভবান হওয়ার চেষ্টা করেন। ধানের বাজারে তথাকথিত সিন্ডিকেটের কোনো অস্তিত্ব নেই। এখন আশুগঞ্জের ধানের গল্লায় মোটা জাতের প্রতি মণ (প্রায় ৪০ কেজি) ধানের দর প্রায় ১ হাজার টাকা এবং সরু জাতের প্রতি মণ ধান বিক্রি হয়েছে ১ হাজার ২৫০ টাকা পর্যন্ত। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বিভিন্ন এলাকার খেত ঘুরে তারা কৃষকদের কাছ থেকে ৯৫০ টাকায় কেনা ধান গল্লায় বিক্রি করেছেন ১ হাজার টাকায়।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেশে ২ কোটি ২৬ লাখ টন বোরো চাল উৎপাদন হতে পারে, যেখানে আগের বছর উৎপাদন ছিল ২ কোটি ১০ লাখ টন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বোরো চাল জাতীয় চাহিদার ৫৮ শতাংশ পূরণ করে।

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর হাওরের কৃষক মো. ইদ্রীস মিয়া (৫৩) জানান, নিজের আবাদে প্রতি একরে ৮০ মণ বোরো (বিআর-১১) ধান পেয়েছেন তিনি; যা আগের বছরের তুলনায় ৮ মণ থেকে ১০ মণ বেশি। তিনি জানান, উৎপাদন বাড়লেও মৌসুমের শুরুতে ধানের দাম আশানুরূপ বাড়েনি। এবার প্রতি মণ ধানের উৎপাদন খরচ গড়ে ৮০০ টাকা হলেও কিছু ধান খেতে ৯৫০ টাকা এবং হাটে ১ হাজার টাকা দরে বিক্রি করেছি। নিকট ভবিষ্যতে দাম বাড়ার আশায় বাকি ধান সংরক্ষণ করে রাখেন বলেও জানান তিনি। নেত্রকোনা জেলার মদনের রিটন মিয়া (৪৭) জানান, তিনি তিন একর জমিতে বোরো করেছেন। একরপ্রতি পেয়েছেন প্রায় ৯০ মণ। তার উৎপাদনব্যয় মণপ্রতি ৭৫০ টাকা। এক একরের ধান খেত থেকে ৯৫০ টাকা দরে বিক্রি করে বাকিটা সংরক্ষণ করে রেখেছেন। রিটন মিয়া বলেন, এখন অসচ্ছল কৃষকরা

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

বোরোর উৎপাদন ও দামে

১৬ পৃষ্ঠার পর

প্রয়োজনে কম দামে ধান বিক্রি করছে। পাইকার, ব্যাপারি ও মিল মালিকরা এসব ধান কিনে মজুত করছে। সামর্থ্যবান কৃষকরা বাড়তি বাজারে চড়া দামে বিক্রির আশায় ধান সংরক্ষণ করে রাখছেন। তার হিসাবে এবার আগের বছরের তুলনায় বোরোর উৎপাদন বেড়েছে ১০ শতাংশের বেশি। ফলে বিদায়ি বছরের মতো এবার ধানের দাম বাড়ার সম্ভাবনা কম।

মেঘনার চরে ধানভর্তি ইঞ্জিনচালিত নৌকায় দাঁড়িয়ে ইত্তেফাকের সঙ্গে আলাপচারিতায় ধানের ব্যাপারি গাজী মো. শরীফ খান জানান, মোবাইল ফোনের সুবাদে এখনকার কৃষকরা প্রতিদিনের ধানের বাজারদর জানেন। চাহিদা বাড়লেই কৃষকরা দাম বাড়িয়ে দেন। অনেক কৃষক সরাসরি মিল মালিকদের কাছে ধান বিক্রি করেন। ফলে ধানের দাম বাড়লে তার সরাসরি সুফল পায় কৃষক। সচ্ছল কৃষকরা রোদে শুকিয়ে ধান সংরক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে। গত বছর প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বিপরীত অবস্থা ছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি।

হবিগঞ্জের মাধবপুর ঘুরে কৃষকের খেত থেকে ধান কিনেছেন হাজী দানা মিয়া অ্যান্ড সন্স চাতাল কলের মালিক চান মিয়া। এ কাজে দেড় যুগের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সার ও বীজের সহজলভ্যতা আর নতুন প্রযুক্তি সুবিধার কারণে কৃষক কম জমিতে কম খরচে বেশি ফলন পাচ্ছে। ভালো দাম পেতে অধিকাংশ কৃষক চাউল কলে সরাসরি ধান বিক্রি করছেন। ফলে ধানে কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর সুযোগ নেই। যে কারণে ধানের দাম কমাতে বা বাড়াতে কোনো যোগসাজশের সুযোগ নেই।

আশুগঞ্জের সোহাগপুরের অটো রাইস মিল মালিক শাহীন আলম জানান, এবারও মৌসুমে তার মিলের জন্য প্রতিদিন ৪ হাজার মণ ধান কিনছেন। কৃষক, ব্যাপারি ও পাইকারদের কাছ থেকে শুকনা মোটা ধান ১ হাজার ৫০ টাকা এবং চিকন ধান ১ হাজার ২৫০ টাকা দরে কিনছেন। তার মতে, ধানের তুলনায় অনেক বেশি লাভের কারণে কৃষকরা ১২ মাসি বা মৌসুমি সবজি চাষে ঝুঁকে পড়েছেন। এতে করে ধান উৎপাদন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়ছে না। ফলে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হলেই ধান-চালের দাম বেড়ে যায়।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাগ্রিবিজনেস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'আমাদের কৃষকরা তাদের নিজের শ্রমের মূল্য ধরে না। এটা মূল্যায়ন করেই ফসলের দাম নির্ধারণ করা প্রয়োজন।' কৃষকের শ্রম ও জমির মূল্য ধরে ধানের দাম নির্ধারণ না করলে কৃষক ন্যায্য দাম পাবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কৃষি অর্থনীতিবিদ ও শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান বলেন, আগের তুলনায় উৎপাদন খরচ বাড়লেও অনুকূল আবহাওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে রেকর্ড পরিমাণ বোরো ধান উৎপাদন হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে সরকার আগের তুলনায় বাড়িয়ে ৩৬ টাকা কেজি দরে ৫ লাখ টন ধান সংগ্রহ শুরু করায় প্রান্তিক কৃষকরা মোটামুটি দাম পাচ্ছে। কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে এ দর আরো বাড়ানো প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, নিজস্ব বা স্থানীয় পর্যায়ে অধিকাংশ কৃষকের ধান সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় এবং ঋণগ্রস্ত কৃষকরা উৎপাদন মৌসুমের শুরুতেই কম দামে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে যখন ধানের চাহিদা বাড়ে তখন দরিদ্র কৃষকের হাতে ধান থাকে না এবং বাড়তি দামের সুফলও পায় না।

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ১৫-০৫-২০২৫ (পৃঃ ০৪)

আসন্ন বাজেট ও কৃষি খাত

ড. জাহাঙ্গীর আলম

এখন পর্যন্ত আমাদের খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। এরই মধ্যে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার হ্রাস পেয়ে ঋণাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত, মায়ানমার ও নেপালের খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার আমাদের চেয়ে প্রায় অর্ধেক কম

নয়া বাজেট আসন্ন। এখন বাজেট প্রণয়নের কাজ চলছে। এরই মধ্যে জানা গেছে, আগামী বাজেটের আকার হতে পারে সাত লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা। চলতি বছরের মূল বাজেটের তুলনায় তা হবে সাত হাজার কোটি টাকা কম। স্বাধীনতার পর এবারই প্রথম টাকার অঙ্কে বাজেটের আকার হ্রাস পাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এই বাজেট হবে সংকোচনমূলক। চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি, রাজস্ব আহরণের ধীরগতি ও বাজেট বাস্তবায়নে সক্ষমতার অভাবহেতু একটি আঁটসাঁট বাজেটই আমাদের কাম্য। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি বাজেটের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান নির্দেশক হচ্ছে দেশজ আয়ের প্রবৃদ্ধির হার। চলতি অর্থবছর (২০২৪-২৫) জিডিপির প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ৬.৭৫ শতাংশ। পরে তা পুনর্নির্ধারণ করা হয় ৬.৫ শতাংশ। এখন তা আরো হ্রাস করে নির্ধারণ করা হয়েছে ৫.২৫ শতাংশ। তবে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর পূর্বাভাস হচ্ছে অনেক কম। জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম অনুমিত হওয়ার কারণ হলো সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিনিয়োগ হ্রাস ও উৎপাদনে স্থবিরতা। অর্থবছরের শুরুতে খরা, পরে ভয়াবহ বন্যা ও অতিবৃষ্টির কারণে কৃষির উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কর্মসংস্থান হ্রাস পায়। মানুষের আয় কমে যায়। আগামী বছর প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর প্রধান নিয়ামক হবে সুস্থির সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ। তা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৫ থেকে ৫.৫ শতাংশ পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব হতে পারে।

প্রবৃদ্ধির হার মাঝারি গোছের হলেও জনজীবনে স্বস্তি থাকতে পারে, যদি তা উচ্চ মূল্যস্ফীতির অতলে তলিয়ে না যায়। বাংলাদেশে প্রায় তিন বছর ধরে বিরাজ করছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি। এর মাত্রা গড়ে ৯-১০ শতাংশের ওপরে। তবে মূল্যস্ফীতির হার ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে তিন মাস ধরে। গত জুলাই মাসে ছিল ১১.৬৬ শতাংশ, নভেম্বরে ১১.৩৮ শতাংশ, ডিসেম্বরে ১০.৮৯ শতাংশ এবং এপ্রিলে ৯.০৩ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রণীত বাজেটে মূল্যস্ফীতির হার প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৬.৫ শতাংশ। গত ১০ মাসের গড় অর্জন প্রায় ১০ শতাংশ। আইএমএফের পূর্বাভাস হলো ৯.৯৮ শতাংশ।

এখন পর্যন্ত আমাদের খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। এরই মধ্যে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার হ্রাস পেয়ে ঋণাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত, মায়ানমার ও নেপালের খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার আমাদের চেয়ে প্রায় অর্ধেক কম। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক খাদ্য নিরাপত্তা ও মূল্যস্ফীতি সম্পর্কিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে ঝুঁকির লাল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির জন্য শঙ্কা করা হচ্ছে, এ বছর দারিদ্র্যের হার ২৩ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে। নিম্নদারিদ্র্যে আরো প্রায় ৩০ লাখ নতুন মুখ যুক্ত হবে। নতুন অর্থবছর ২০২৫-২৬ সালের বাজেটে এই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করাই হবে বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে অনুসৃত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির সঙ্গে সুস্থির রাজনীতির সমন্বয় করে এবং কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বাড়িয়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বাংলাদেশের মতো মাথাপিছু কম আয়ের একটি দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৪ শতাংশের নিচে এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতি ২-৩ শতাংশে নামিয়ে আনা উচিত।

খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাসের প্রধান শর্ত হলো কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি। সম্প্রতি কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু এর প্রবৃদ্ধির হার এগিয়ে চলছে অনেক ধীরগতিতে। এখন কৃষি খাতে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি খুবই কম। ২০০৯-১০ অর্থবছরে অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫৭ থেকে বর্তমানে প্রায় ৩ শতাংশের কাছাকাছি অবস্থান করছে। সার্বিক কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ৩.২১ শতাংশ, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে অর্জিত ৬.৫৫ শতাংশের অর্ধেক মাত্র। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে কৃষি খাতের উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ৪-৫ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। এ জন্য কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন নেই। ২০১১-১২ অর্থবছরের মূল বাজেটের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের আকার ৪.৭৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় কৃষি বাজেট বেড়েছে ৩.৭৮ গুণ। অর্থাৎ সে তুলনায় কৃষি বাজেট বাড়েনি। ২০১১-১২ অর্থবছরের মোট বাজেটে কৃষি বাজেটের হিস্যা ছিল ১০.৬৫ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে তা নেমে আসে ৫.৯৪ শতাংশে। একইভাবে কৃষি ভর্তুকির হিস্যা নেমে আসে ৬.৪ থেকে ২.১৬ শতাংশে। অর্থাৎ যে হারে মোট বাজেট বেড়েছে, সে হারে কৃষি বাজেট ও ভর্তুকি বাড়েনি।

চলতি অর্থবছরে কৃষিবিষয়ক পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৪৭ হাজার ৩৩২ কোটি টাকা। এর মধ্যে শস্য কৃষি খাতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ২৭ হাজার ২৪১ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৩.৪১ শতাংশ। অন্যদিকে ২.৪৫ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বন ও পরিবেশ, ভূমি ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। এটি ছিল অপ্রতুল। ফলে কৃষি খাতের বরাদ্দে আগের বছরের সংশোধিত বরাদ্দ থেকে ১৮.২১ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কৃষি ভর্তুকি খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ২৫ হাজার ৬৪৪ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে তা কমিয়ে রাখা হয় ১৭ হাজার ২৬১ কোটি টাকা।

এবার বন্যার কারণে আউশ ও আমন ধানের উৎপাদন মার খেয়েছে। চালের উদ্বৃত্ত হ্রাস পেয়েছে। ফলে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে চালের মূল্য। বেড়েছে খাদ্য মূল্যস্ফীতি। বর্তমানে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে তা হ্রাস পাচ্ছে। এই ধারাকে গতিশীল করার জন্য কৃষিতে বরাদ্দ ও ভর্তুকি বাড়ানো দরকার। উপকরণ ভর্তুকির সঙ্গে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ওপর মূল্য সহায়তা দেওয়া দরকার। তিন-চার মাস ধরে বাজারে শাক-সবজি, আলু ও পেঁয়াজের দাম অপেক্ষাকৃত কম। এতে স্বস্তিতে আছে ভোক্তারা। কিন্তু খুবই অস্বস্তিতে আছেন কৃষকরা। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা উৎপাদন খরচটুকুও তুলতে পারছেন না। এমতাবস্থায় মূল্য সহায়তা স্কিম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে কৃষকরা লোকসান থেকে পরিত্রাণ পাবেন। আগামী বাজেটে তার বিধান থাকা উচিত। মোট বাজেটে কৃষি খাতের হিস্যা বাড়ানো উচিত। বৃহত্তর কৃষি খাতে মোট বাজেটের ন্যূনপক্ষে ১০ শতাংশ বরাদ্দ এবং ৫ শতাংশ ভর্তুকি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বাজেট প্রণয়নের সময় জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি কত হবে, তা বলা হয় না। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি খাতে ২০২৪-২৫ সাল পর্যন্ত তিন বছরের গড় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ৪ শতাংশ। অর্জিত হয়েছে ৩.২ শতাংশ। এই হার বাড়ানো দরকার। ন্যূনপক্ষে তা ৪ শতাংশ অর্জন করা উচিত। অন্যথায় মোট জিডিপির প্রবৃদ্ধির হারে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বর্তমানে কৃষিতে একটি কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ সালে কৃষি জিডিপিতে শস্য খাতের শরিকানা ছিল ৭৫.৫৪ শতাংশ। প্রাণী, মৎস্য ও বনজ সম্পদের শরিকানা ছিল যথাক্রমে ৭.৬৬, ১০.৪৮ ও ৬.৩৯ শতাংশ। ২০২৩-২৪ সালে কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের ফলে শস্য খাতের শরিকানা কমে গিয়ে ৪৬.৭৫ শতাংশে দাঁড়ায়। প্রাণী, মৎস্য ও বনজ সম্পদের শরিকানা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১৬.৩৭, ২১.৫৮ ও ১৫.৩০ শতাংশে উপনীত হয়। দেশের মানুষের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন ঘটছে এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ছে। তাই দুধ, ডিম, মাংস ও মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা দরকার। আগামী বাজেটেও তার প্রতিফলন থাকা উচিত। উপখাতওয়ারি বরাদ্দ ও ভর্তুকির নীতিমালায় ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বর্তমানে দেশে পশুপাখির উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু এদের উৎপাদিত বস্তু দুধ, মাংস ও ডিমের মূল্য অনেক চড়া। এর প্রধান কারণ উৎপাদনের উপকরণ খরচ বেশি, বিশেষ করে পশুখাদ্যের দাম খুবই চড়া। এর দাম কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা উচিত। মাছ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে। কারণ বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়ছে না। প্রতিবছর প্রায় ১ শতাংশ হারে প্রাকৃতিক জলাশয়গুলো দখল হয়ে যাচ্ছে বা দূষণে হারিয়ে যাচ্ছে। নদী-নালায় মাছ ধরার অবাধ সুযোগ বিদ্যমান থাকায় পোনা মাছ পর্যন্ত ধরে নিয়ে যাচ্ছে মানুষ। সমুদ্রের বিশাল ভাণ্ডার থেকে মৎস্য আহরণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার। বর্তমানে আমাদের সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের পরিমাণ খুবই কম।

কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে আমাদের সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ এখানে ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হতে পারে। মৌসুমি ফল, শাক-সবজি ও পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে উপযুক্ত কাঠামো গড়ে তোলা দরকার। ধান-চাল সংরক্ষণের জন্য ন্যূনপক্ষে ৪০ লাখ টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন গুদাম নির্মাণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে চালু থাকা গুদামগুলোর ধারণক্ষমতা মাত্র ২২ লাখ টন। এগুলো কৃষি বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। কৃষিপণ্যের রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য একসময় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রদান করা হতো। বর্তমানে তা ১০ শতাংশের বেশি নয়।

কৃষিকাজে এখনো যন্ত্রের ব্যবহার সীমিত। সে কারণে প্রতি ইউনিট পণ্যের উৎপাদন খরচ বেশি। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ উৎপাদন খরচ হ্রাস ও পণ্যের মান বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। দুই বছর ধরে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ উৎসাহিত করার জন্য ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের যন্ত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এখন ওই প্রকল্পটি অকার্যকর। বিগত সরকারের আমলে দুর্বৃত্তায়নের কারণে এটি বন্ধ করা হয়। বর্তমানে তা নতুন আঙ্গিকে সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে চালু করা যেতে পারে। বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব খুবই বেশি। এর মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমনের প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। এ ক্ষেত্রে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আলাদা বরাদ্দ থাকা উচিত। কয়েক বছর ধরে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষির উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে। কৃষকদের সহায়তার জন্য দুর্যোগ মোকাবেলা তহবিল গঠন করা দরকার। আসন্ন বাজেটটি কৃষি ও কৃষক বান্ধব হবে, এটিই প্রত্যাশা।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত কৃষি অর্থনীতিবিদ
সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং সাবেক উপাচার্য
ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL
Date: 15-05-2025 (Page: 01,11)

Bumper Boro harvest promises food security boost, inflation relief

ANM Mohibub Uz Zaman, *Dhaka*

The country is likely to see a bumper Boro production this season, promising a significant boost to the national food basket and the possibility of easing persistent food inflation.

Boro harvest has begun across the country with 62% already complete and the yield projected to be 1,38,66,100 tonnes from the harvested acreage of 31.280 lakh hectares, according to data from the Department of Agricultural Extension (DAE).

This year, farmers cultivated Boro paddy on 50.465 lakh hectares of land with a target of 226.002 lakh tonnes of rice. The production is projected to increase by 15 lakh tonnes from last year's output.

Farmers are anticipating a good harvest this year as no natural disasters such as droughts, heatwaves, cyclones or pest outbreaks have been reported yet.

Harvesting Boro paddy has already been completed in the haor region and 19,90,929 tonnes of rice came from 454,398 hectares of land, according to the DAE.

>> Page-11 Col 5

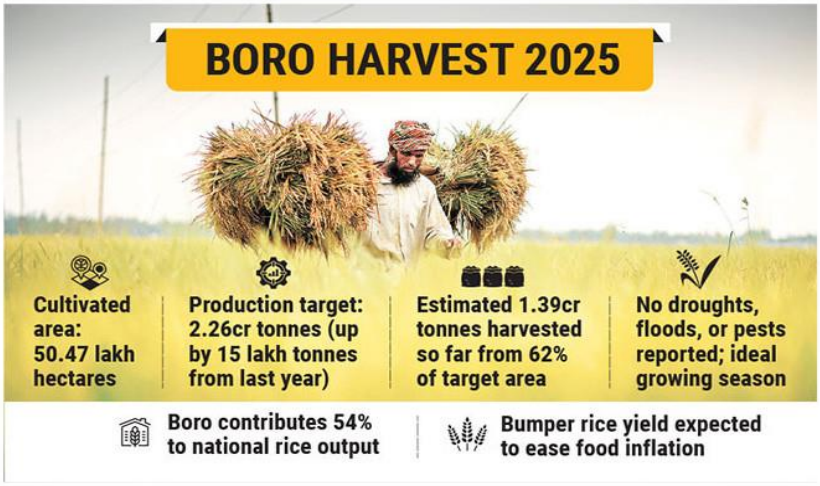

Bumper Boro harvest promises food

From Page-1

Agro-economist and researcher Dr Jahangir Alam told the Daily Sun that Boro contributes a major 54% to the total rice production of the country. Good production of Boro rice will increase food security and decrease food inflation in the country.

"Good production of Boro rice is a good sign. This year, the supply of rice in the market will increase compared to previous years. As a result, food security will be ensured until the upcoming Aman season. The rise in rice prices will largely come to a halt. This will lead to a reduction in food inflation," said the economist.

He projected that the production of Boro rice may increase to 2.20 crore tonnes this year against last year's 2.10 crore tonnes. "The main driver of the country's recent high inflation is elevated food inflation. Behind this are reduced production due to last year's drought, floods, excessive rainfall and lack of rainfall. Once Boro rice enters the market in plenty, its price will decrease. Food inflation will ease further," he said.

In March, food inflation slightly decreased to 8.93%. Key staples such as rice, fish, and vegetables were major contributors, with rice alone accounting for 14.62% of overall inflation and 34.14% within the food inflation category. Fish and vegetables followed, contributing 27.05% and 14.20% to food inflation, respectively.

Among individual food items, brinjal (17.12%), medium rice (16.73%), coarse rice (12%) and hilsa (11.37%) were identified as leading contributors to price hikes in March.

"When the price of rice decreases, other food commodities also get cheaper. We do not need to import rice this year due to bumper production," said Jahangir Alam.

The price of fine rice, such as Miniket, has decreased as Boro harvest started in full swing and new rice is entering the market.

Over the past two weeks, the price of this type of rice has dropped by Tk10-Tk15 per kg, depending on the variety.

Polash of Matlab Traders at Mirpur 13 said the price of fine quality Miniket rice has reduced drastically as newly harvested rice has entered the market.

"The price of Mozammel brand of Miniket has declined to Tk3,900 from Tk4,750 per sack (50kg) and that of Rashid brand to Tk3,600 from Tk3,900 per sack in the last two weeks," he said, adding that the price of BR28 has come down to Tk2,750 from Tk2,900 per sack.

Boro rice is the major crop in Bangladesh. Boro paddy is transplanted in December-January and harvested in April-May. Its cultivation heavily relies on irrigation. There are many high-yielding and hybrid varieties available to cultivate during the Boro season.

The most common Boro rice varieties are BRRI Dhan28, BRRI Dhan29, BRRI Dhan47 and BRRI Dhan50.

Farmers report that they are also cultivating some of the newly released varieties, such as BRRI Dhan84, BRRI Dhan92, BRRI Dhan102, and BRRI Dhan105.

They primarily rely on underground water for irrigation. In large parts of northern and central Bangladesh, the groundwater level drops significantly during the Boro season, making irrigation more expensive. Additionally, due to the extremely high temperatures, farmers are forced to increase the frequency of irrigation, further raising costs.